আখ্যানের সন্দর্ভ ঃ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

বাসব দাশগুপ্ত

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসিকা, একটি উপন্যাস ‘ শেষ রাতের শিয়াল’ ও ‘গুল্মলতার ইলেকট্রন’ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ‘উত্তরাধিকার’ (রায়গঞ্জ) এবং ‘আরম্ভ’ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়। প্রায় পঞ্চাশ পাতা করে এই উপন্যাসদ্বয় পাঠে নেহাতই নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব। সাধনের কথাভঙ্গির বিশিষ্টতা, তা অবশ্য এক দিনে, কয়েকটি লেখায় সচরাচর কেউ খুঁজে পায় না। ছোট গল্প নিয়ে বেশ কয়েক বছরের একটা প্রচেষ্টা, ইতিহাস-সময় এবং সমন্বয়-বিরোধিতার মেলবন্ধনে গড়ে তোলা আখ্যান, এ-সব বিকল্প ধারার (মূল ধারা) সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকমাত্রই জানেন। লেখকের অভিজ্ঞতা বিস্তৃতির সঙ্গে চেতনার সীমাও অবশ্যই প্রসারিত হয়ে যায়। এই পথে কোন লেখক ব্যক্তিজীবনের সংকটকে সাহিত্যের সীমা চিহ্নিত করেন, আর অন্য বিশেষ কথাশিল্পীরা জীবন, ইতিহাস, সমাজ, চক্ষুবাস্তব-মনবাস্তব, সময়কে মিলিয়ে শু করেন এক অনন্য অনুসন্ধানপর্ব। ব্যক্তিকে অতিক্রম করে স্থান আর কালকে সৃষ্টিসঙ্গী করে সাধনের যাত্রার উত্থান বিন্দুর দপে ‘ শেষ রাতের শিয়াল’, ‘গুল্মলতার ইলেকট্রন’ উপস্থাপিত, আমাদের সামনে। যেহেতু এই দুটি রচনাই ২০০১ সালে লিখিত, এবং অন্তঃসম্পর্কীত, তাই একথা বলাই চলে। ১৪০৮, শারদে প্রকাশিত, ‘শুধুই’, ‘মাংসখেকো ঘোড়া’ ইত্যাদি ছোট গল্পে এই উপন্যাসদ্বয়ের চিন্তাবীজ নিহিত ছিল, মনে করি।

অতি সম্প্রতি বাংলা কথাসাহিত্যে আখ্যান নির্মাণ নিয়ে যে পরীক্ষামূলক যাত্রা শু হয়েছে, হয়ত বা অনেকের অলক্ষ্যে, যাঁদের কলমে, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রধান। কাহিনীকেন্দ্রকে ঘিরে রচিত আখ্যান যেহেতু লেখকের প্রকৃত মনোজগতের সন্ধান দেয় তাই নতুন শতাব্দীর সাহিত্যে আলোচনার বিষয় কাহিনীকে ছেড়ে না-কাহিনীর দিকে, এখন। গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে একটা ধারাবাহিক, সচেতন চেষ্টা, পরীক্ষামূলক বলা চলে, একটা স্পান্দনিক পর্যায় অতিক্রম করে সাধন বর্তমানে, এইখানে।

‘ শেষ রাতের শিয়াল’ ‘গুল্মলতার ইলেকট্রন’ উপন্যাসদ্বয়ে চরিত্র-বিস্তৃতি ব্যাপক নয়। যতটা হয় সাধারণ উপন্যাসে তার থেকে কম। মহাদ্রুম নয়, কাষ্ঠাল বৃক্ষ, শিশু, ভাবতে পারলে বিশালতার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কেন্দ্রবাস্তবতাকে পরিহার করে দু’টি কাহিনীতেই প্রাধান্য পেয়েছে প্রান্তিক বাস্তবতা। স্থায়ী কিন্তু অস্পষ্ট কেন্দ্রীয় কাহিনীকে রক্ষা করে এক ব্যাপক কাহিনীহীন চলন, ফলত পাঠকালে প্রান্তিক চরিত্রদের কণ্ঠস্বর, মহান উপস্থিতি, প্রতিধবনিত সর্বত্র। উপন্যাসদ্বয়ের প্রথমটিতে (শেষ রাতের শিয়াল), মুখ্য চরিত্র একটা থাকলেও তার প্রাধান্য, আস্ফালন কার্যত নেই। দ্বিতীয় উপন্যাসে (গুল্মলতার ইলেকট্রন) সেই অর্থে কোন মুখ্য চরিত্রই নেই, বহুমাত্রিক, বহুউপস্থিতিতে রচিত একটি আখ্যানমাত্র। বোধ করি, ‘ শেষ রাতের শিয়াল’-এ আখ্যান নির্মাণের নবপ্রকারণের সূচনা আর ‘গুল্মলতার ইলেকট্রন’ একটা পরিণতি, যদিও এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার চূড়ান্ত এখনও অনির্দিষ্ট। বিভিন্ন সম্ভাবনার সূত্রগুলো বেজে উঠেছে, হয়ত বা বিপুলতার সম্ভাবনা নিয়ে কোন সূত্র এখনও অপেক্ষায়, সামান্য আঘাতে বেজে ওঠার জন্য।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা, একে আবিষ্কারও বলা চলে, দাঁড়িয়ে আছে দু’টি বিন্দুর ওপর। একটি স্থান, অন্যটি ক

াল। আমরা সাধারণ কথাসাহিত্যে দেখতে পাই একটি স্থির স্থান ও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাওয়া সময়ের প্রতিচ্ছবি। পাঠকমাত্রই জানেন, এমন বহুপঠিত একটি গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী', গল্পটির সময়কাল চল্লিশ বছর, লোভী ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর মর্মান্তিক পরিণতির ধারাবাহিক মর্মস্পর্শী বিবরণ। জমিদার শ্যামদাস ও তার স্ত্রী শিবরাণীর সন্তানের সঙ্গে নিজের সন্তানের বিনিময়, শিবরানীর মৃত্যুর পর প্রথম অগ্রদানী, ব্রাহ্মণ হিসেবে পিন্ড ভক্ষণ তার চোদ্দ বছর পর নিজের ছেলের মৃত্যু ও শ্রাদ্ধে, আপন ছেলের পিন্ডের সামনে বসে শুনতে হয়, পুরোহিতের মুখে 'খাও হে চক্রবর্তী'। অঞ্চলটি স্থির, চল্লিশটা বছর সচল অর্থাৎ কিনা সময়ের স্বাভাবিক এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে মানুষের, ব্যক্তিমানুষের বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সুচা কাহিনী। প্রথা এই যে, বাঙলা কথা সাহিত্যে, সময় এগোবে (ফ্লাশ ব্যাক অংশ বাদ দিলে), কাহিনী ধীরে ধীরে ক্লাইমেক্সে পৌঁছোবে। সময়ের চলনের সঙ্গে কাহিনীর গতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমানুপাতিক।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য বিন্যাসে বাংলা কথাসাহিত্যের ট্রাডিশনাল এই সমীকরণকে ভাঙা হয়েছে। আলোচ্য দু'টি রচনাতেই কাহিনী কখনও সেই অর্থে ক্লাইমেক্সে পৌঁছায় না, আর যেহেতু সময়ই এখানে মুখ্য বিষয়, যাকে নিয়ে পরীক্ষা। তাই সময়ের গতি কখনও একমুখী নয় বরং উভমুখী, বহুমাত্রিক। সমানুপাত অথবা ব্যাস্তানুপাতের মত সম্পর্ক নির্ধারক পরিমাপদ্বারা এই আখ্যানের বিচার অসম্ভব। ছোট গল্পের বা উপন্যাসের শীর্ষ বিন্দু-র ধারণা এক্ষেত্রে ভেঙে গেছে। আখ্যানের গতি যদি সরলরৈখিক হয় তবে নিশ্চিতভাবে তা পাঠযোগ্যতা হারাবে, এ-ক্ষেত্রে আখ্যান তরঙ্গগতির, কখনও বা উদ্বেগসৃষ্টিকারী, কখনও বা শিথিল কিন্তু ভাবতে পারলে অতল। তরঙ্গের উত্থান রেখা-স্থানও তাই অসীম উচচতা পর্যন্ত পৌঁছানোর সোপান সংকেতযুক্ত। পাঠককে স্বাধীনতা দেওয়ার এই ধারা, সর্ব অর্থে এক নতুন চেষ্টা। যেহেতু এই রচনাদ্বয়ে কাহিনীকে অতিক্রম করেছে পারিপার্শ্বিক (না-কাহিনী) তাই সূচনা বিন্দু, পরিণতি বিন্দু ইত্যাদি প্রচলিত ধারণা, অবান্তর। যে কোন স্থানকেই ধরা যেতে পারে সূচনা, সমাপ্তি তত্ত্বও এই আখ্যান ধারায় প্রযুক্ত হয় না।

' শেষ রাতের শিয়াল' উপন্যাসিকাতে তবালা কথক-চরিত্র। তার চোখে, কথায় কাহিনীসূত্রটির বুনন। যেহেতু আদিবাসী, এই সমাজ ব্যবস্থায় নিজস্ব সংস্কৃতির পৃথক উপস্থিতির সঙ্কটে আচ্ছন্ন, তাই কাহিনীর সূচনা থেকেই একটা বিপন্নতা ছুঁয়ে যায় নির্মাণকে। 'ওঁড়াও' হওয়ার জন্য একটা বিপন্নতা, শিক্ষিত হওয়ার জন্য নিজস্ব জনগোষ্ঠীর থেকে মানসিক বিচ্ছিন্নতা, তবালার মধ্যে কাজ করে।

আমার অঞ্চলে এখন মাত্র ৩০/৩৫ ঘর ওঁড়াও পরিবার থাকলেও , আদিবাসী কল্যাণ সমাজ বলে যে ক্লাবটি আছে, আমি তার নাম মাত্র সভ্য।

তবালা মাধ্যমিক প্রথম বিভাগ, পড়া ছেড়ে পোস্ট অফিসে পিয়ন, বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করে। ক্লাবে আসে ভাস্কর নাইয়ে, আদিবাসী যুবক, সকলকে হারিয়ে যাওয়া একটি নদীর কথা বলে, সোনাই নদী , নদীটির পুনদ্ধারের ব্যাপারে আহ্বান জানায়। যথাবিধি পাত্তা পায় না, কিন্ত তবালা এই জনগোষ্ঠীর প্রথম মাধ্যমিক, এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়। নদীর ব্যাপারে হোক অথবা বিপন্ন সামাজিক অস্তিত্বের ব্যাপারে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথাকথিত উচচতর সংস্কৃতির চাপে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাওয়া অনেকের কাছেই স্বাভাবিক, এই নিয়ে বেশির ভাগ মানুষ কিছু চিন্তাই করে না। কিন্তু তবালা নিজের জনগোষ্ঠীর এই বিপন্নতা আর নদীর হারিয়ে যাওয়াকে অস্বীকার করতে পারে না, চেতনায়।

ডাকঘরে ঢুকে প্রতিদিন দুপুরে সাইকেলে ত্রিং ত্রিং চিঠি বিলি করতে-করতে, প্রায় দেড় বছরের মধ্যেই টের পেলাম, ঐ নদীটির দুধারে ঘিঞ্জি জনবসতির মধ্যে আমাকে চিঠি বিলি করতে হয়। একদিন সংবাদে ছাপা হল ' সোনাই'-এর নাম। তখনই আমি মনে মনে যোগ করতে শু করেছিলাম অসংখ্য ডোবা-পুকুরের মালাগুলো যা এখনও মাসে মাসে দু-চারটে বিলুপ্ত হয়ে, আবাসনের সৌন্দর্যে বিশেষ মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে।

এরপরই আখ্যানের চলন শু হয় স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে। অবশেষ থেকে পুনস্থাপনের দিকে, এই সভ্যতার আসন্ন ধবংস বিন্দু থেকে নির্মাণের বৃত্তে। এখান থেকেই তৈরী হয় একটি সন্ধানী পরিক্রমণ, যা কখনও ব্যক্তির গন্ডিতে বদ্ধ না থেকে সামাজিক অনুসন্ধানের রূপ পায়। উপন্যাসিকাটির কালের উভমুখী গতির সাহায্যে চক্ষুবাস্তব আর শিল্পবাস্তব যুক্ত হয়ে য ায়, আশ্চর্য নির্লিপ্তিতে। প্রথাগত কাহিনী গড়ে তোলার বৃত্তটির পরিধি ছুঁয়ে, এমন কী ছিন্ন করে আখ্যান নির্মাণ করেছেন সাধন, এই কাহিনীতে যা অবধারিত সন্দর্ভ সৃষ্টি করেছে।

সাধন এই আখ্যান, বুননে আর পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছেন না। এই খানে, এই উপন্যাসিকার তিনি যা অনুপস্থ ানীয়, অপরিমেয় তাকেই উপস্থাপন করেছেন। এইখানে স্মরণযোগ্য, অবশ্যই কবি জীবনানন্দ দাশ, তিনি তাঁর কবিতায় বহুক্ষেত্রেই অপরিমেয়

ওইখানে বিকেলের সমিতিতে অগনন লোক

উঠেছে বক্তা এক-ঝড়যন্ত্রহীনভাবে-দেখে

দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক

সহসা দেখেছে কেউ... (সমিতিতে, মহাপৃথিবী, পৃষ্ঠা - ৭৩)

এই কবিতাটি কাল অতিক্রম করার অব্যর্থ ইঙ্গিতবাহী আর সাধনের আলোচ্য উপন্যাসিকাটি (শেষ রাতের শিয়াল) একই সঙ্গে স্থানিক কিন্তু বহুকালিক। বিবাহছিন্ন, তলতা, ওঁরাও-দের মধ্যে প্রথম মাধ্যমিক, শিক্ষা যার নিজস্ব জনগোষ্ঠী থেকে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, অন্তর্মুখী, ছড়িয়ে যায় বহু চরিত্রের সমাবেশে। কারা সেই সব চরিত্র? ওয়ার্ড নেতা রমেশ সরকার, পোস্ট অফিসের সুন্দর কুন্ডু, আর ফণি, শৈল এবং ভাস্কর নাইয়া। ফণি-শৈল ছিল, এক সময়ে, আর ভাস্কর নাইয়া অনেকটা 'রক্ত করবী'-র রঞ্জন, উপস্থিতি চেতনা বাহিত। ঐ যে 'দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক' কেউ দেখতে পায়, পেতে পারে, যেমন-পায় তবালা, শোনে--

--ঈশ্বর মুখুজ্যে নদীটাকে কিনেছিল।
--কোন নদী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
--ঐ, তোমার সোনাইকে।
--কী ভাবে, কেন?
--সে অনেক গল্পো মা। মাথায় হাত তুলে চারপাশে ঘোরালে যত জমি, সবটার মালিক ঈশ্বর শুঁড়ি।
--শুঁড়ি, মদের ব্যবসা ছিল?
--নিজে নয়, টাকা লগ্নী করতেন, চড়া সুদে। মদ ব্যবসার জন্য।

ফনি আর তবালার সংলাপ। ফণি আদতে নেই,বহুকালপূর্বে মৃত। 'শেষরাতের শিয়াল' উপন্যাসিকাটির কোন কালীক সীমারেখা নেই। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, চূড়ান্ত অনিবার্যতায়। প্রসঙ্গে থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা, একটি অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত, শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে ধারণা, আর আছে শূন্যস্থান যা পূরণ করবেন পাঠক সমান্তরাল নির্মাণে।

এই রচনার স্থান যদি বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু, একটা শহরতলী আর পরিধিটা হল সময়, অসীম। প্রচলিত ধারণায়, মানুষের

সৃষ্টিতে সময় সুশৃঙ্খল। সময়ের অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য। সাধন চট্টোপাধ্যায় ' শেষ রাতের শিয়াল' উপন্যাসিকা আখ্যান বুননের সময় এই চেনা-জানা শৃঙ্খলকে ভেঙেছেন, সচেতনে। বহুত্ববাদ ও বহুকণ্ঠস্বরের উপস্থিতির জন্য ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাসের কৃত্রিম ভেদরেখা এখানে অনুপস্থিত। তবালা অতীত কণ্ঠস্বরের শ্রোতামাত্র, কখনওবা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত-বাহক। চরিত্রটি মাধ্যম হিসেবে ক্রিয়াশীল, বহুজনের একজন মাত্র।

তবালা কী বাস্তব চরিত্র? সে যে-সব চিন্তা করে তা, এক প্রজন্মের শিক্ষিত কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব? যেহেতু সমাজভাবনার মাধ্যমরূপে তবালা উপস্থিত তাই এ-সব প্রশ্ন কোন অর্থে ওঠে না। আখ্যানে অনুরণিত হচ্ছে, শহরতলীর এক কোণে বসবাসকারী ওঁড়াও পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি, মানসিক সরলতা। যারা বাংলায় বহুকাল আছে অথচ নিজেদের সেই অর্থে বাঙালী বলে ভাবতে পারছে না। এক চরম বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, পারস্পরিক সংঘাত। বর্তমান ভারতবর্ষে আদিবাসী সমস্যার সৃষ্টি-বিন্দু হল এই বিচ্ছিন্নতাবোধ। একটা অবিশ্বাস, অতীতের নানা টুকরো ঘটনাকে আবার সামনে নিয়ে আসে--

আমাদের অঞ্চলে শুয়োর মারা ছাড়া কোন ভায়োলেন্স হয়নি। একবার খুব ছোটবেলায় লিচুবাগানের গভীর জঙ্গলে ক্যাওড়া পাড়ায় একটি অর্ধবৃদ্ধকে কে বা কারা গলায় দড়ি লাগিয়ে মগডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বাঙালি পাড়ায় এ-নিয়ে কয়েকদিন উত্তেজনা গেছে। আর একবার আমাদের বন্ধু ওঁড়াও-এর ছোট মেয়েটাকে গর্ভবতী করেছিল বাঙালি একটি বেকার যুবক। ওদের বাড়িতে তারামতী মেয়েটা ঠিকে ঝি-এর কাজে লেগেছিল।

যে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায়, তা হোক না শহরতলী, মানুষের সম্পর্ক যেমন পরিস্থিতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , তার একটা ভগ্নরেখা, অস্পষ্ট ইঙ্গিত, আখ্যানে ছড়িয়ে আছে। আর আছে প্রচুর ফাঁক যেমন আগের উদ্ধৃতিটিতে পরপর তিনটে ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু সে-ভাবে কোন বর্ণনা নেই, ফলে পাঠক এখানে ফ্রেম মুক্ত স্বাধীন, ইচ্ছে মত নিজেরাই নির্মাণ করতে পারে সমান্তরালভাবে। পাঠকের চিন্তার সূত্র হিসেবে নানা উপকরণ কিন্তু উপস্থিত, এটাই সাধনের এই ধরনের আখ্যানের উজ্জ্বলতা।

প্রথাগত গদ্যে যুক্তিগ্রাহ্যতাই বোধকরি একমাত্র সত্য, আর তা' যদি কাহিনী বিন্যাসের পরিপূরক হয়, তো কথাই নেই। সাধনের আখ্যানে অসংখ্য যুক্তিফাটল (লজিক্যাল ব্র্যাক) বর্তমান। বাংলা কবিতায়, জীবনানন্দে এই ধরনের যুক্তি ফাটল দেখা যায়। এই যুক্তি ফাটল, যেখানে স্পন্দমান, সেখানে, পাঠক এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণে স্থাপিত হন, এই অনির্ণেয়তার এই আবহে তিনিও পাশাপাশি নির্মাণে অংশ না-নিলে উপন্যাসিকাটির প্রার্থিত বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না। প্রশ্ন আসে কেন তবিকেলে শহরতলীর রাস্তা শুনসান দেখে, কেন ঠাকুদ্দা বলেছিল, তাদের ' ছোটবেলা শুয়োরগুলোর পাথা থাকত।' আর সেই ঘটনাটা ' সেই পুরনো দালানটি, কড়ি-বর্গার ছাদসহ শেষ নিশ্বাসের মতো ধীরে ধীরে মুখ থুবড়ে পড়ছে' কেন এবং কি ভাবে? এই রকম অজস্র বিন্দু, যা পাঠককে রেখাদ্বারা যোগ করতে হবে, আখ্যানের মধ্যেই তিনি পেয়ে যাবেন রেখা-নির্মাণে সমাধান সূত্র। ভাস্কর নাইয়া, এ-কালের রঞ্জন, তবালা যেন বা একালের নন্দিনী, যার চেতনায় ভাস্করের উপস্থিতি। একটা বিন্দুতে কালের অবিরাম ঘূর্ণনে চেনা যেত না, বোঝা যেত না শহরতলীর মাটিতে বহুযুগ ধরে নিঃশব্দে বয়ে চলা কায়েমী স্বার্থের স্বরূপটা।

ভোর রাতে, শিয়াল শেষ প্রহর ঘোষণা করে, তারপর ভোর, নতুন দিন। তবালা, আদিবাসী শিক্ষিত যুবতী, 'গ্রীণ বেঞ্চে' নদীটার উপস্থিতির স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে না তবুও জজ সাহেবসহ সকলেই বোঝে নদীটা ছিল, এই সভ্যতা গ্রাস করেছে আস্ত একটা নদীকে, যেমন করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক হাঁ-মুখে তাদের অস্তিত্বকে, স্বাতন্ত্রতাকে হারিয়ে ফেলছে ওঁড়াও জনগোষ্ঠী। শেষ পর্যন্ত সোনাই নদীর অবশেষ, অজস্র সার দেওয়া পুকুরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকার চায় তারা আদলতের কাছে, নদীটাকে খুঁজে যাওয়ার অধিকার। এ-অধিকার অর্জন করে, একটা আরম্ভের জন্য এ-অধিক

ার তাৎপর্যপূর্ণ। অতীতের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। সাধন এখানে শিল্প-বাস্তবের সাহায্য নিয়েছেন আবার--

বাধা অবস্থায় একটি ঘোড়ার কঙ্কাল-- দড়িটা পচে উঠলেও ছিড়ে যায় নি। পুরোনো মৃত হলে, কঙ্কালে পরিণত হয় প্রাণী। কথা বলে, চলাফেরাও চালায়। কিন্তু শীতল বরফ-কুচি ও গন্ধ মিশে অজস্র কথার কঙ্কাল বাতাসে ভাসে।

বাড়ি ফেরার পথে তবালা দেখে এক ঝাঁক বক, ভাবে এই বকগুলো সেই হারিয়ে যাওয়া সোনাই নদীর খোঁজে যাচ্ছে, একটা সন্ধানপর্ব, স্বাধীনভাবে খুঁজে যাওয়ার জীবন। অথবা সেই হারিয়ে যাওয়া দরগা, যা খুঁজে পেলেই পাওয়া যাবে সোনাই নদীটি, আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির পুনদ্ধারের সংকেত!

এ প্রসঙ্গে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব মতামতটাও জেনে নেওয়া যেতে পারে। আখ্যান বলতে কি বুঝব? কাহিনীরেখা, শব্দ, বাক্য, উপমান উপমিত এবং দেশ-কালের অক্ষে ব্যক্তি ও ঘটনার অবস্থান-- সব মিলিয়ে একটা নক্শা ছক? যদি উপরোক্ত প্রতিটি বিষকে আমরা বল Force হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে সরল বলেরএকত্রিত লব্ধিই কি আখ্যান? কোনও লব্ধিকে যেমন আমরা নানা উপাংশে বিভক্ত করতে পারি, কোনও আখ্যানের বিনির্মাণেও সে-ভাবে ঘটতে পারে।

(বিকল্প আধুনিকতা সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প।। কলাকৃতি)

বহু ঘটনার সমাবেশ, সময় নামক ধারণাকে ভেঙ্গে নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণের যে শৈলী এই উপন্যাসদ্বয়ে প্রযুক্ত হয়েছে তা সচেতন পাঠক মনে ধাক্কা খেয়ে নব-নির্মাণ ক্রিয়ায় নিয়োজিত হতেই পারে।

লুই বোর্হেস The Garden of Forking Path's-Û)'A book which does not include it's opposite or 'counter-book' is considered incomplete বলেছেন। সাধন, তাঁর আখ্যান রচনায়, বৈপরীত্য-চিত্রনে অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠেছেন, আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ে। পাঠক কিছুতেই পাঠকালে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে আন্দাজ লাগাতে পারবেন না।

বাংলা কথা সাহিত্যে এখনও পর্যন্ত যেখানে যুক্তির রৈখিকতাই মান্য সেখানে সাধনের ' শেষ রাতের শিয়াল' আর 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' বহুরৈখিক, বহুকৌণিক ও বহুত্ববাদী। বেশীর ভাগ উপন্যাসের কথা যদি ভাবা যায়,তবে দেখা যাবে যুক্তির দৃঢ়তাই সেখানে মূল কথা, গানিতিক এই প্রথার সাহায্যে নিপাট বুনন কাহিনীটিকে গড়ে তোলে। ফলত পাঠক সূচীমুখ যাত্রায় বাধ্য ফ্রেমে বন্দী হতভাগ্য, কেবল পড়ে যাওয়া ছাড়া তার সক্রিয়তার অন্য কোন ক্ষেত্র নেই। যেন বা টি. ভি.সিরিয়াল, যা দেখাচ্ছে তাই দেখছি। কেন্দ্র চরিত্রকে ঘিরে একটা নির্মাণ, যেখানে পারিপার্শ্বিক ঘটনা, সময়, প্রাকৃতিক উপাদান, অপ্রধান চরিত্রগুলো অবশ্যই কেন্দ্র চরিত্রকে অবলম্বন করে চালিত হয়। ও এ-যাত্রায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে লেখক পৌঁছে যান একটা পরিণতিতে।

পাশাপাশি সাধন চট্টোপাধ্যায় 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'-এ, ' শেষ রাতের শিয়াল'-এ যে গদ্যরীতির প্রয়োগ করেছেন, যে আখ্যান গড়েছেন তা, রীতিমত পাঠক-অংশগ্রহণকারী (পার্টিসিপেটরি)। সেই অর্থে নায়ক-নায়িকা বর্জিত এই আখ্যান, প্রাধান্য পাচ্ছে ঘটনাবলী। যুক্তির একরৈখিকতা বিহীন এই রচনায় বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত ইত্যাদি সময় বিন্দু ঘটনাবলীর উপর উভমুখী ক্রিয়া চালায়, অর্থাৎ কিনা, যে ঘটনা ঘটে গেছে, যা ঘটছে, যেটা ঘটতে পারে তার সবটুকু একটি বিন্দুতে যুক্ত হয়ে যায়। আর কে না জানে ঘটনার পরিণতি হয় না, ঘটনা ধারাবাহিক-- ঘটেই চলে, একটা থেকে অন্য একটায়। ফলে 'গুল্মতার ইলেকট্রন'-এ কোন পরিণতি নেই কিন্তু ক্রমবিকাশ আছে। হেমরঞ্জন, শৈল, দীপ্তিরঞ্জন, মীরা, গীতা, সুরেশ ইত্যাদি চরিত্ররা অসংখ্য বিন্দুর মত, কখনও যুক্ত হয়ে নির্মাণ করে আবার বিযুক্ত হয়ে বি-নির্মাণও ঘটায় একই সঙ্গে।

উপন্যাসে, এ ধরনের আখ্যান নির্মাণ শুধু নতুন ধরনের চেষ্টা বললে কম বলা হয়, এক্কেবারে নতুন পথ, আবিষ্কারের তুল্য। এই ধরনের যেহেতু অনেকটাই না-বলা অংশ থেকে যায় তাই, লেখকের পাশাপাশি, সমান্তরাল পাঠকের নির্মাণ ক্রিয়াও বাধ্যতামূলক। নববই-এর পর থেকে সাধন, তার বহু ছোট গল্পে, উপন্যাসে নিছকই বাস্তবের নকল করছেন না। যেন তিনি ক্রমশ অনুভব করছেন, বাস্তবকে হুবহু উপস্থাপিত করা, নকল করা যায় না, এ প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা থাকতে বাধ্য। স্মরণযোগ্য, অতীতের অনেক লেখকের বহু আলোচিত অতিবাস্তব সাহিত্যকর্ম আজকাল মধ্যবিত্ত বুকশেলফে ঘুম দিচ্ছে, শীতঘুম নয় বোধকরি মরণঘুম। মনে হতে পারে নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে সাধন চট্টোপাধ্যায় স্রষ্টা হিসেবে, রহস্যময়তার পৃষ্ঠপোষক। একই সঙ্গে বাস্তব-অতিবাস্তব-পরাবাস্তব-অবাস্তবের মিশ্রণ অসাধারণ গদ্য স্বচ্ছতায় তিনি এখন, চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ভর বিপজ্জনক যাত্রায় রত। আখ্যানের যে স্বচ্ছতা (ট্রান্সপেরেন্সি) এনেছেন সাধন তা লেখক-পাঠক দ্বৈত অনুভূতি সৃষ্টি করতে বাধ্য। পাঠক কতটা দেখবে, বর্তমান বিন্দুর উপর দাঁড়িয়ে, তা নির্ভর করবে তাঁর সক্রিয়তা ও মনোভঙ্গির উপর। আপাতভাবে সময় সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলার কারণে একটা মহোৎসবের সূচনা হচ্ছে, অনেকটা আদিবাসীদের উৎসবে সকলের সমান সক্রিয়তা অথচ অসমান সামর্থ্যের যোগদানের মত।

'গুল্মলতার ইলেকট্রন' উপন্যাস শু হয় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, প্রথম থেকেই আবহটা স্বাভাবিক থাকে না--

হেমরঞ্জন মজুমদার ভাবতেই পারেননি ভবিষ্যতে পুরো বাড়িটা তীব্র দাহ্যদ্রব্যের মত ফরফরাৎ আগুনে ভস্মীভূত হবে। তার পরিবারের কিন্তু একজনের দেহেও সামান্য আঁচটুকু লাগবে না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শৈল, একমাত্র পুত্র দীপ্তিরঞ্জন ও স্ত্রী মীরা, তিন তিনটি মেয়ে এবং তাদের স্বামীরা। আশর্চ্য! সব যখন গভীর রাতে দরজাবন্ধ-ঘরে ঘুমিয়ে-কেবল ঝোপঝাড়, গাছগাছালির উঠোন, কলতলা-পায়খানার শুকনো লতাগুল্মের ওপর নির্জন নবমীর গুঁড়ো আলোছায়া ভুতুড়ে তাজিম হয়ে আছে-- তখনই রহস্যের আগুনে এরা ঠিকঠাক।

প্রথম থেকেই একটা রহস্যময়তা, জানিয়ে দেওয়া হয়, হেমরঞ্জনের বয়স আগামী ফাল্গুনে ১০৭ পূরণ হবে, সুতরাং ব্যাপারটা চেনাজানা গন্ডীতে থাকছে না। একটা যৌথ পরিবার, তার যা কিছু বৈশিষ্ট্য, সবটুকু নিয়ে একটা প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। হেমরঞ্জনের ছেলে বিয়ে করেছে। স্কুল শিক্ষিকা মীরাকে, মীরার বয়স হয়েছে, ফলে ঋতুচ্যুতা, অসুস্থ। অন্য বোন ও তাদের স্বামী-ছেলেপুলেরা বুড়ো বয়সে দীপ্তিরঞ্জনের বিয়েটাকে মানতে পারেনি ভালভাবে। সম্পত্তিগত একটা চোরা আশঙ্কা ওদের মনে। সাধন এই উপন্যাসে একটি যৌথ পরিবারের নানা ব্যক্তি, তাদের মানসিকতা ছাড়াও প্রত্যেকের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন লোকের সম্পর্ক তুলেছেন এমন ভাবে যে, উপন্যাসের ব্যপ্তি হয়েছে অসীম। বহু প্রসঙ্গ এসেছে টুকরো টুকরো, কিছুটা বা সম্পূর্ণতা ছাড়াই। আর এইখানেই আখ্যানের জয়, সে পাঠককে ভাবতে দেয় নিজের মত করে, যাকে আগে বলা হয়েছে সমান্তরাল নির্মাণ। 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' উপন্যাসের দিকে তাকানো যাক--

ক. ছোট মেয়ে ঝুলন এবং তার বর শক্তি খুব টনটনে। জানিয়ে দিয়েছে জরাজীর্ণ জঙ্গলে ঢাকা ছয় কাঠার মধ্যে তারা থাকলেও, চারপাশের ফ্ল্যাট, দোকান-ঘরের রমরমায় জানে এর মূল্য কত! চুলচেরা হিসেবের একটি পয়সাও যেন তাদের অগোচরে কিছু ডিল না হয়! (বিষয়গত সংঘাতের চিহ্)

খ. প্রেমের মত একটি অপরাধকান্ডে সীতা নাকি হাতেনাতে গঙ্গার ঘাটে দুজনকে পেয়ে গেছিল। মৃণাল ঠিক পাশের বাড়ির না হলে, ব্যাপারটা মানিয়ে নেওয়া যেত! দূরত্ব অনেক কিছুর মাত্রা বদলে দেয়। (মধ্যবিত্ত পারিবারিক সমস্যার চিহ্)

গ. দ্বিতীয় ব্যাচটিকে খেতে দেওয়ার কিছু আগেই শৈলর খেয়াল হল চানটা সারা হয়নি। তাহলে কি খাইয়ে-দাইয়ে বিকেলে চান করবে? (যৌথ পরিবারে গৃহিণীর বাধ্যতামূলক জীবন-যাপনের চিহ্)

ঘ. দীপ্তি বিশ্বাস করে, অধিকাংশ মানুষ সরব হয়ে থাকার চাইতে নীরব প্রতিবাদই জীবনের বেশি অংশে কাটায়। এটাই পরিণতি। (একদা রাজনীতি করা যুবকের বর্তমান পরিণতির চিহ্)

ঙ. ঔপনিবেশিক স্মৃতি কিংবা শ্রদ্ধা জাগে লাল-সাদা চামড়া দেখে, আর সমুদ্রপকুল ধরে জেলিফিসের মত কনডোম ভাসতে ভাসতে এইডস ঢোকে শীতল চোখে। (বাঙালী মানসিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের চিহ্)

চ. এখন মার কুমড়ো কাটার ইঙ্গিত পেয়ে, গীতার ইচ্ছে হল কাল অফিস ছুটির পর সুপার মার্কেটে গিয়ে উলের একটা নী-কাপ কিনে আনবে মায়ের জন্য। বেতো গীরা লাগিয়ে রাখলে কিছু আরাম পায়। সুপার মার্কেটে বহুদিন যাওয়া হচ্ছে না। অফিস কলিগ কল্পনাদি বলেছিল কফির সঙ্গে এখন দামি টেবিলকথ ফ্রি দিচ্ছে...। (মধ্যবিত্ত মানসিতকার চিহ্)

এই ধরনের উদাহরণ আরোও, অজস্র। বিবিধ প্রসঙ্গ এসেছে কতগুলো মানুষের জীবন-যাপনকে ঘিরে। যেমনটি ঘটে বাস্তবে, একটা জটিল বুনন। হেমরঞ্জন ও শৈল, দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তাদের সন্তান দীপ্তিরঞ্জন, গীতা, ঝুলন। গীতা ও ঝুলনের স্বামী যথাত্রমে সুরেশ এবং শক্তি-- একই বাড়িতে পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসবাস, পারস্পরিক ভালবাসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসে। আসে নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতির টানাপোড়েন, একটা ধর্মের ষাঁড়কে কেন্দ্র করে। বামপন্থী রাজনীতির দল-উপদল ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে কী আসে না? অজস্র প্রসঙ্গমুখ উঁকি দেয় ফলে টানা গড়গড় করে পড়ে যাওয়ার মত উপন্যাস হয় না 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'।

এই যে যৌথ পরিবার, যেখানে বসবাসকারী মানুষজনকে চেনা যায়, তাদের কথাবার্তায় প্রকাশ প্রায় কখনও উদারতা কখন বা তীব্র আত্মকেন্দ্রীকতা, যাদের ঘিরে মৃণাল, অজিত, এক আশ্চর্য চরিত্র আলবার্তো।

আলবার্তোর মস্তগুণ যে-কোনো ভাষা অনর্গল কইতে পারে। তো, দশমিনিটের মধ্যে হেমরঞ্জনকে মোহাবিষ্ট করে ১৫দিন রয়ে গেল তারই কোয়ার্টার। লোকটা নাকি টাকা পয়সা আধুলি আনি দুআনি ম্যাজিকের সাহায্যে তিন ডবল করতে জানে। সারা পৃথিবী এই গোপন বিদ্যা নিয়ে ঘুরছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সমকালীন প্রয়াসে শিল্প-বাস্তব ফিরে ফিরে আসছে চক্ষু বাস্তবের পাশাপাশি। ল্যাটিন আমেরিকার বর্তমান গদ্য-ঘরানায় যেমনটি দেখা যায়। তো, আলবার্তো হেমরঞ্জনের পয়সা কড়ি তিনগুণ করে দিয়ে পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়ে যায় একটি বকুল গাছের চারা। অদ্ভুত ! নয়?

সব দিক থেকেই প্রথাবহির্ভূত সৃষ্টি এই 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' আর ' শেষ রাতের শিয়াল'। উপন্যাসদ্বয়ের আখ্যানে রয়েছে অসংখ্য যুগ বৈপরীত্য। লুকিয়ে আছে সমান্তরাল কাহিনী নির্মাণের এক উপকরণ, একটা স্পষ্ট কাহিনীরেখার পাশাপাশি একটা অস্পষ্ট রেখা। ' শেষ রাতের শিয়াল'-এ, সোনাই নদীর সন্ধানের ঠিক পাশে ওঁড়াওদের নিজস্ব সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'-এ যৌথ পরিবারের ভাঙনের পাশে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ থেকে শু করে ব্যক্তি স্বার্থমুখী রাজনীতি, সবটাই।

আঁদ্রে ব্রেতো বলেছেন 'কিছু কিছু শব্দ আচমকা অন্যান্য শব্দ সমবায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব বেগে রকেটের মত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। তেমন কিছু কিছু সমকালীন অন্য লিখিয়েদের মধ্য থেকে সবেগে এই গদ্যরীতি, আখ্যান নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এটা নিশ্চিতভাবে সাধারণ পরীক্ষার পর্যায়ে নয়, একটা বড় বদল,তুলনামূলকভাবে প্রায় আশিরনখর ধরে ঝাঁকুনি। বাংলা ভাষার প্রথম নির্মাণ কালে, সেই সান্ধ্যভাষা, সেই সংকেতধর্মী চর্যাপদকে স্মরণ করা যেতে

পারে। দ্বিঅর্থবোধক, এক অর্থ বাহ্য, লৌকিক অপরটি পারিভাষিক, যা দীক্ষিতদের অবগত। এক্ষেত্রেও একটি সাংকেতিক নির্মাণ। গল্পের আড়ালে আরও একটি চরম গল্প। ক্ষেত্র বিশেষে প্রথম গল্পটি থেকে দ্বিতীয়টি যেন বা আরও উত্তেজক, কূলপ্লাবী।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসদ্বয়ে রয়েছে নানা সংকেতধর্মী সাবপ্লট। একটা বিস্তৃত সময় থেকে কিছুটা তুলে এনে ত ার চরিত্রদের পরিচিত করে আবার তাদের স্থাপন করা হচ্ছে নানা সময়ের বৃত্তে। ফলে চরিত্রদের কার্যত্রমে পাল্টাচ্ছে, অ ার কে না জানে একই মানবচরিত্র সময় ও পরিস্থিতিভেদে তার রি-অ্যাকশন পালটে ফেলে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্য ালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত একটি সেমিনারে সাধন, আখ্যানকে কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণরূপে চিহ্নিত করে স্পষ্ট বলেছেন 'আখ্যানের প্রতিক্রিয়া আমাদের শিক্ষিত করে এবং শিক্ষার বি-নির্মাণও ঘটায়।' শিক্ষা বলতে, নিশ্চিত, প্রথ াগত সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যসৃষ্টির শিক্ষা। নিষ্ক্রিয় সাহিত্যপাঠের বিকল্প হিসেবে লেখকের নির্মাণের পরিপূরক সক্রিয় সা হিত্যপাঠ, অর্থাৎ ট্রাডিশানকে ভাঙা নতুন একটা ধারার প্রবর্তন।

'গুল্মলতার ইলেকট্রন' উপন্যাসে কতগুলো কথা-ভঙ্গির উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আখ্যানকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়, আখ্য ানের প্রচন্ড সন্দর্ভ সৃষ্টি করে।

অ. কথার মজাটাই হচ্ছে, অনেক দিনের হলে কী হবে বেঁচেও থাকে বহুকাল (পুরনো কথার প্রসঙ্গে সুরেশের ভাবনা)

আ. প্রাদেশিক কমিটির সভ্য অথচ চোখের দুকোণে পিচুটি জমতে জমতে দৃষ্টিই ফুরিয়ে যাচ্ছে (বর্তমান রাজনৈতিক নেত াদের প্রসঙ্গে)

ই. জলের মত সব তরলেরই বরফ হয়? রক্তের? প্রতি যুদ্ধে যত রক্ত ঝরছে, জমাট বাঁধলে হিমালয়কে ডিঙ্গিয়ে যাবে (দীপ্তিরঞ্জনের ভাবনা)

ঈ. শরীর মানে বৃক্ষ; ফল হচ্ছে কামনা এবং বোঁটা খসে যাওয়ার অর্থ নারীর ঋতুচ্যুতা হওয়া। সব জেনেই তো সুজন দুজনের ইলেকট্রন ও প্রোটন নিয়ে ছোট্ট পরমাণু বাঁধতে এগিয়েছিল। (ঋতুচ্যুত হওয়ার পরও বিবাহ প্রসঙ্গে মীরার ভ াবনা।)

এইরকম আরো অনেক। এই ভাবনাগুলো যথার্থই পরবর্তী ভাবনাকে উস্কে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? শৈল কুয়োপ াড়ে অজস্র হরিণ দেখতে পায় এই শহরতলীতে। কেন দেখে? আধা পাগল একটি চরিত্র কুন্দন মাঝরাতে বারান্দায় উঠে জুতো চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনাগুলো ঢেউ-এর মত ঘটতে থাকে, একের পর আছড়ে পরে, নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে ন া। সেহেতু উপন্যাসটিতে কাহিনী ধরে আলোচনা করলাম না। তবে শেষ অংশটা এতই অন্যধরণের যে উল্লেখ করতেই হবে--

১. এখন এ-অঞ্চলে আর জ্যোৎস্না ওঠে না। উঠলেও আকাশ-রেখা বদলে যাওয়া অঞ্চলটাতে জ্যোৎস্নার শরীরে এতই কার্বন মনোক্সাইড ঝুলে থাকে, মনে হয় অন্ধকার কিছুটা রহস্যময় হতে চাইছে।

২. চারপাশের ফ্ল্যাটবাড়ির জানলা থেকে আগুন দেখতে কেমন হয়েছিল, বলতে পারল না কেউ। মৃত আশুবাবুর স ম্পর্কের ভাইপো নুলো হাবার মত বলে অ্যাদ্দিন বোঝা যায়নি, জঙ্গল-ঝোপে চমৎকার এতখানি জমি ছিল।

কল্পনায় ভেসে উঠছে একটা গুল্মলতা ঢাকা পোড়ো বাড়ি, সবুজে সবুজ। সামনে ছোট মাঠ, গাছ-গাছালীপূর্ণ। হয়ত বা চারিদিকে ফ্ল্যাটবাড়ি, মনে হয় ফুসফুসের মত কাজ করছে সবুজ জমিটা। ঐখানে বহুদিন আগে, বাড়িতে থাকত হেমরঞ্জন-শৈলী-মীরা-ঝুলন-সুরেশ-শক্তি, আসত কুন্দন মাঝরাতে গোপনে। ঝগড়া হত, ভালবাসা হত। অসুস্থতার পর আরোগ্য, যেমন হয় আম লোকের জীবনে, তেমনি। অর্থাৎ উপন্যাসটির সব মুহূর্তই গড়ে উঠেছে অতীত সময়ে। সাধন স্থানটাকে অপরিবর্তিত রেখে কালের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, বর্তমানের উপর স্থাপন করেছেন অতীতকে। তাই বলছিলাম সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই আখ্যান নির্মাণ প্রায় আবিষ্কারের সমতুল্য।

একই সঙ্গে, একটি স্থির স্থানের উপর, চরিত্রাবলীর উপর অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভাব ফেলছে, আর সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিত্রিয়া। 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'-এ অতীত বহু কৌণিক, সদ্য অতীত, দূর অতীত, নানাভাগে বিভক্ত। ফলে সময়টা বহুবিধমাত্রা নিয়ে হাজির হচ্ছে। সাধন চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছেন, ছোট গল্প নিয়ে, এবার উপন্যাসিকা হয়ে উপন্যাসে। সময় তার অন্যতম প্রিয় মৃগয়াক্ষেত্র। আখ্যান রচনায় এই অস্ত্র, নিপুন ব্যবহারে আশর্চ্য সন্দর্ভ সৃষ্টি করেছে। 'গুল্মলতার ইলকেট্রন' উপন্যাসে স্থান-কাল-চরিত্র কেমন করে নতুন ভাবনার গতিমুখ খুলে দেয়, তা অতি বিস্ময়ের। কতগুলি চরিত্রের প্রয়াসে আশর্চ্য স্বচ্ছতা সৃষ্টি করে, বিবিধ ঘটনায়। সে-কালের রাজনীতি, ধর্মীয় মৌলবাদে, অনৈতিকতার সৃষ্টি, জীবনের ক্লান্তি, যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থার ভাঙনের সূচনা, সমাজ ব্যবস্থার পালটে যাওয়ার প্রবণতা-- এক এক করে পাঠকের চিন্তাসূত্র উন্মুক্ত করে দেয়। অতীতের বিবিধ ঘটনাবলী চূড়ান্ত প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করে বর্তমান সময়কে কেন্দ্র করে। ' শেষ রাতের শিয়াল'- এ অতীত চরিত্ররা ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি নিয়ে আর 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'-এ অতীতের নানা ঘটনাই প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে বর্তমান সময় বিন্দুতে। কিন্তু শব্দের অনুরণনের মত ঘটনার অনুরণন ঘটতেই থাকে, আর সেই কম্পাঙ্কের ইঙ্গিতময়তাই পাঠকের সমান্তরাল নির্মাণের সূত্র রচনা করে। চরিত্রগুলো নানা প্রতিত্রিয়ার মাধ্যমে, ঘটনার মাধ্যমে সামাজিক বা মানবিক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, ঐ অবস্থার সঙ্গে পাঠক সহজেই নিজেকে একাত্ম করতে পারেন।

উপন্যাসের নামটি এবার দেখা যাক, 'গুল্মলতার ইলেকট্রন', প্রথাবর্হিভূত নয় কি? একটু তলিয়ে ভাবা যাক, লতা-পাতা; উদ্ভিদ বহুকোষদ্বারা গঠিত, কোষ প্রোটোপ্লাজমের সমষ্টি, প্রোটোপ্লাজমের জৈববস্তুগুলো নানা অজৈব বস্তু থেকে উৎপাদিত আর কে না জানে, অজৈব বস্তুগুলো আসলে ইলেকট্রন-প্রোটন দ্বারা তৈরী। ফলত, নামেই একটা গোটা বস্তুকে কণিকায় ভেঙে ফেলার ইঙ্গিত।

ফিরে আসা যাক সেই দৃশ্যে, যেখানে বাড়িটা সবুজ গুল্মলতায় আচ্ছাদিত। উদ্ভিদদের আশর্চ্য আলিঙ্গনে আবদ্ধ। ভাবা যাক, গুল্মলতার দেহ ইলেকট্রন-প্রোটনে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে অতীত, তার বহুমাত্রিকতা দিয়ে। গড়ে উঠছে এই উপন্যাসের সন্দর্ভ সৃষ্টিকারী উপাখ্যান।

আজকের যুগ আর কাহিনীতে আবদ্ধ থাকার নয়, আজকের গদ্য-ভাষা আর একমুখী হবে না। পাঠকও অংশ গ্রহণ করতে চাইছেন সৃষ্টিকর্মে, তাই লেখকের গড়ে তোলা কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকার সময় শেষ, এখন যুগ সমান্তরাল নির্মাণের। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ রাতের শিয়াল' আর 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' একটি সূচনা বিন্দুরূপে চিহ্নিত হতে পারে, আমরা এতদিন এই আরম্ভের জন্য, বড় দীর্ঘদিন এই লগ্নের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। তবে স্বীকার করি, এধরনের তীব্র সন্দর্ভ সৃষ্টিকারী আখ্যান নির্মাণের পিছনে দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনা, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বিজ্ঞান চেতনা-গভীর সাহিত্যবোধ কাজ করে। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের সামনে ভিন্নতর কোন উপায় ছিল না আর কে না জানে, গাছ রোপন করার পর জল-বাতাস-আলো দিয়ে বেশ কিছু বছর অপেক্ষার পরই ফল-ফুল পাওয়া যায়। সাধন চট্টোপাধ্যায়

এই পর্যায়গুলো পেরিয়েছেন এখন আখ্যান অংশ তারহাতে নতুন সন্দর্ভ সৃষ্টির হাতিয়ার। একজনকে সামনে রেখে এ যুগের গদ্য সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তুলে ধরার অর্থ, একটি ধারার স্বীকৃতি আর চিহ্নিতকরণ, যুগলক্ষণকে স্বীকার করে নেওয়া। বোধকরি, এই সেই পথ যা হবে আগামী কথা-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম বিকল্প ধারা, একদিন প্রধান স্রোত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com